BL College Journal

ISSN 2664-228X
Volume -1, Issue-2, 2019
pp. 80-97

মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী : কেস স্টাডি মাগুরখালী ও হাসনাবাদ

দিব্যদ্যুতি সরকার, পিএইচডি

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ এন্ড লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী, বাংলাদেশ

পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

ই-মেইল : dibyadyuti.sarkar@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সৃষ্ট শরণার্থী সমস্যা বহুমুখী মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। এই বিপর্যয়ের প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুধাবনের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের দুইটি এলাকায় কেস স্টাডি করা হয়েছে। এর একটি হলো খুলনা জেলার মাগুরখালী ইউনিয়ন এবং অন্যটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণার হাসনাবাদ রেল স্টেশন সংলগ্ন বস্তি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মাগুরখালী ইউনিয়নের নব্বই শতাংশের বেশি অধিবাসী শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। মূলত প্রাণ রক্ষার জন্য তারা দেশান্তরী হলেও অনেকেই সেখানে প্রাণ হারায়। মাত্র সাত-আট মাসের শরণার্থী জীবনে এই এলাকার চার শতাংশের বেশি অধিবাসী মারা যায়।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের হাসনাবাদ রেলস্টেশন সংলগ্ন জনবসতিহীন একটি প্রান্তর ১৯৭১ সালের মে মাস নাগাদ শরণার্থীতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ আশ্রয় নেওয়ায় এলাকাটির নাম হয় 'জয় বাংলা বস্তি'। ডিসেম্বরে বাংলাদেশ মুক্ত হলে এই শরণার্থীরা স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসেছিল। কিন্তু এই ফিরে আসা শরণার্থীদের অনেকে নিরাপত্তার অভাব ও চরম দারিদ্র্যের কারণে ভারতে পুনঃশরণার্থী হয়।

মাগুরখালীর শরণার্থীরা জীবন বাঁচানোর জন্য দেশত্যাগ করলেও শেষ পর্যন্ত বিপুল জীবনহানীর মধ্য দিয়ে তাদের শরণার্থী জীবন শেষ হয়। অন্যদিকে জয় বাংলা বস্তি সাক্ষী হয়ে থাকে পুনঃশরণার্থী অনুপ্রবেশের। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এ এক মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা, যার অভিঘাত অসংখ্য সাধারণ মানুষ আজও বয়ে বেড়াচ্ছে। মাগুরখালী ও হাসনাবাদের এই দুটি কেসস্টাডি থেকে এই অভিঘাতের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুধাবন করা যায়।

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো শরণার্থী। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগজনিত শরণার্থী বিনিময়ের মতো পরিস্থিতিতেও যে সকল মানুষ দেশত্যাগ করে ভারতে যায়নি, ১৯৭১ সালে তারা জীবন রক্ষার জন্য ভারতে পাড়ি জমায়। খুলনা অঞ্চলে এই দেশত্যাগের প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানি সেনা, রাজাকার, শান্তি কমিটি, জামায়াতে ইসলামী এবং মুসলিম লীগের কর্মীদের অত্যাচার। এছাড়া অনেক এলাকার স্থানীয় দুর্বৃত্তরা মুক্তিযুদ্ধজনিত অরাজকতার সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্তী হিন্দু এলাকায় নির্যাতন ও লুঠপাটে অংশ নেয়। বহু বছরের পরিচিত প্রতিবেশীর এহেন আকস্মিক পরিবর্তনে হিন্দুরা স্বভাবতই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছিল।[১] রাষ্ট্র এবং সমাজ কোথাও নিরাপত্তা না পেয়ে তারা শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। শরণার্থীদের জীবনে যে বিরাট মানবিক বিপর্যয় ঘটে যায়, তা অনুধাবনের জন্য এই প্রবন্ধে মাগুরখালী ও হাসনাবাদ স্থান দুটিকে কেস স্টাডির আওতায় আনা হয়েছে।

সূচক শব্দ

মুক্তিযুদ্ধ, শরণার্থী, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, মানবিক বিপর্যয়

শরণার্থী কী

১৯৫১ সালে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন (UNHCR) শরণার্থীর সংজ্ঞার্থ প্রদান করে। এই সংজ্ঞার্থ অনুসারে শরণার্থী হলো :

> ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা কিংবা কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণি বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে নিজের চিরাচরিত আবাসভূমি থেকে অন্যত্র বসবাসকারী ব্যক্তি, যিনি নিজ দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে আস্থাশীল নন এবং এতৎসংক্রান্ত ভীতির কারণে স্বদেশে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম।[২]

ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর ইউরোপিয়ান মাইগ্রেশান (ICEM) শরণার্থীর সংজ্ঞার্থে যুদ্ধ এবং দুর্যোগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে। আইসিইএম-এর সংজ্ঞার্থ অনুসারে, যিনি যুদ্ধ কিংবা দুর্যোগের শিকার হয়ে এবং জীবননাশের ভয়াবহ হুমকির মুখে দেশ ত্যাগ করেছেন, তিনি শরণার্থী।[৩]

১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত শরণার্থী বিষয়ক আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত দক্ষিণ-এশীয় আঞ্চলিক কর্মশালায় শরণার্থী প্রত্যয়টির একটি সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করা হয়। সেখানে শরণার্থী বলতে বোঝানো হয় :

> ক. নিজ দেশের বাইরে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তি, যিনি তার নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয়, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতীয়তা কিংবা বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার কারণে অথবা তার নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নির্যাতিত হওয়ার আতঙ্কে সত্যিই সন্ত্রস্ত। একই কারণে তিনি তার নিজস্ব আবাসভূমির নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে আস্থাশীল নন এবং সেখানে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক অথবা অক্ষম।

খ. যিনি তার নিজ দেশের সর্বত্র অথবা কোনো অংশে সংঘটিত জনশৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে বিনষ্টকারী বহিরাক্রমণ, দখল বা বৈদেশিক আধিপত্য অথবা মানবাধিকারের চরম লংঘনের কারণে তার চিরাচরিত আবাসভূমি ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।[৪]

উপরি-উক্ত প্রত্যেকটি সংজ্ঞার্থ থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিতভাবে শরণার্থী হিসেবে সনাক্ত করা সম্ভব। তবে শেষোক্ত সংজ্ঞার্থ অধিকতর স্পষ্ট এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া জনগোষ্ঠীকে সুস্পষ্টভাবে শরণার্থী হিসেবে চিহ্নিত করে। বর্তমান প্রবন্ধে শরণার্থী সংক্রান্ত ধারণা প্রকাশের জন্য এই সংজ্ঞার্থটি গ্রহণ করা হয়েছে।

শরণার্থী শ্রেণিকরণ

ধর্ম সম্প্রদায়গত দিক দিয়ে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ শরণার্থী ছিল হিন্দু, বাকিরা মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের। ব্যতিক্রমী কিছু উদাহরণ বাদ দিলে জাতিগত দিক দিয়ে এরা সকলেই ছিল বাঙালি। ভারতে আত্মীয়-স্বজন থাকায় কিছু বিহারিও এ সময়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। যদিও অধিকাংশ বিহারি পাকিস্তান বাহিনীর সমর্থক হিসেবে কাজ করায় তাদের আনুকূল্য পেয়েছিল এবং এই কারণে তাদের ভারতে চলে যাওয়ার প্রবণতা ছিল কম। নিচের সারণিতে শরণার্থীদের ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কিত পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১

শরণার্থীদের ধর্মীয় পরিচয় (১৬ আগস্ট ১৯৭১ পর্যন্ত)

শরণার্থীদের ধর্মীয় পরিচয়	**সংখ্যা**	**শতকরা হার**
হিন্দু	৬৯.৭১ লক্ষ	৯২.২৬%
মুসলমান	৫.৪১ লক্ষ	৭.১৬%
অন্যান্য	০.৪৪ লক্ষ	০.৫৮%
মোট	৭৫.৫৬ লক্ষ	১০০%

উৎস : *Bangladesh Documnets,* vol. 1, (New Delhi: Ministry of External Affairs, India, 1972), p. 446.

১৬ই আগস্ট ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া এই পরিসংখ্যানে মোট শরণার্থী দেখানো হয়েছে ৭৫.৫৬ লক্ষ জন। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতে সর্বমোট শরণার্থী প্রবেশ করেছিল ৯৮,৯৯,৩০৫ জন।[৫] সারণি ১-এ প্রাপ্ত হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত থেকে বোঝা যায় যে, শরণার্থীদের নব্বই শতাংশের বেশি ছিল হিন্দু। ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া শরণার্থীদের এই অনুপাত ডিসেম্বর পর্যন্ত অটুট ছিল ধরে নিলে হিন্দু শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯১,৩৩,০৯৯ জন, মুসলমান শরণার্থীর সংখ্যা ৭,০৮,৭৯০ জন এবং হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য অমুসলিমদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭,৪১৬ জন।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আদমশুমারি না হওয়ায় এ সময়কার হিন্দু জনসংখ্যার কোনো

পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে ১৯৬১ ও ১৯৭৪ সালের আদমশুমারিতে তাদের যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ধর্মের অধিবাসীদের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ১৯৬১ সালের জনগণনায় পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৯৩,৮০,০০০ জন এবং মুসলমান ৪,০৮,৯০,০০০ জন। ১৯৭৪ সালে হিন্দু ও মুসলমানের এই সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯৬,৭৩,০০০ ও ৬,১০,৩৯,০০০ জন।[৬] অর্থাৎ ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তেরো বছরে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩.১০ শতাংশ। তেরো বছরের এই বৃদ্ধির হারকে ভিত্তি ধরলে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২.৩৮ শতাংশ। সেক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট হিন্দুদের সংখ্যা হয় ৯৬,০৩,০০০ জন। এর মধ্যে ৯১,৩৩,০৯৯ জন শরণার্থী হয়েছিল ধরলে হিন্দু শরণার্থীর শতকরা হার মোট হিন্দু জনগোষ্ঠীর ৯৫.১১ শতাংশ। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে হিসাব করলে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের সংখ্যা হয় ৫,৬৩,৮৭,০০০ জন (১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে বৃদ্ধির হার ৪৯.৩ শতাংশ; এই পরিসংখানকে ভিত্তি ধরলে দশ বছরে মোট বৃদ্ধি হয় ৩৭.৯ শতাংশ)। এর মধ্যে ৭,০৮,৭৯০ জন শরণার্থী হয়েছিল ধরলে মুসলিম শরণার্থী হয় মোট মুসলমান জনগোষ্ঠীর ১.২৬ শতাংশ।

ধর্মীয় এই পরিচয় ছাড়া পেশাগতভাবে বিন্যস্ত করলে শরণার্থীদের মধ্যে কিছু বিশেষ প্রবণতা চোখে পড়ে। শরণার্থীদের ৮৫ শতাংশ (প্রায় ৯,৫০,০০০ পরিবার) ছিল কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক। স্বভাবতই এরা ছিল গ্রামের অধিবাসী। অবশিষ্ট ১৫ শতাংশ ছিল শিল্প শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী, কারিগর ও শহরের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ।[৭] এই পনেরো শতাংশ পেশাজীবীদের অন্তত ৪-৫ শতাংশ গ্রামের অধিবাসী হয়ে থাকবে। ফলে গ্রাম থেকে যাওয়া ৮৫ শতাংশ কৃষিজীবী শরণার্থীর সাথে ৪-৫ শতাংশ অন্য পেশার শরণার্থী যোগ করলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট শরণার্থীর প্রায় ৯০ শতাংশ। তৎকালীন গ্রামীণ বাংলাদেশে রাজনীতির সাথে জড়িত থাকা মানুষের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। বিশেষত গ্রামের অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষের রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ কোনো যোগ ছিল না। ফলে শরণার্থীদের অধিকাংশই ছিল অরাজনৈতিক মানুষ।

মাগুরখালী ইউনিয়নের শরণার্থীদের সম্প্রদায়গত শ্রেণিকরণ সমগ্র বাংলাদেশের শরণার্থী শ্রেণিকরণের সাথে প্রায় অভিন্ন। মাঠ সমীক্ষার উপাত্ত থেকে জানা যায়, ইউনিয়নের প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষ এ সময়ে শরণার্থী হয়েছিল। পেশাগত দিক দিয়ে এই ইউনিয়নের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ ছিল কৃষক ও কৃষি শ্রমিক। সমগ্র ইউনিয়নে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তি ব্যতীত অধিবাসীদের সকলেই ছিল অরাজনৈতিক ব্যক্তি।[৮]

মাগুরখালী ও হাসনাবাদ

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার একটি ইউনিয়ন মাগুরখালী। ২৩.৯৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই ইউনিয়নে ৩০টি গ্রাম রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এটি পার্শ্ববর্তী শরাফপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাগুরখালী ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বশীল মোট ১০টি গ্রাম কেস স্টাডির আওতায় আনা হয়েছে।

গ্রামগুলো হলো : কাঞ্চন নগর, কাঠালিয়া, গজালিয়া, ঘুরুনিয়া, চণ্ডীপুর, চিত্রামারী, ঝরঝরিয়া, পশ্চিম পাতিবুনিয়া, পূর্ব পাতিবুনিয়া ও মাগুরখালী। আদমশুমারি না হওয়ায় ১৯৭১ সালে ঐ গ্রামগুলোর জনসংখ্যা সম্পর্কে জানা যায় না। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুয়ায়ী ঐ ১০ টি গ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩০৮৮ জন।[৯] ইতঃপূর্বে 'শরণার্থী শ্রেণিকরণ' শীর্ষক অনুচ্ছেদে দেখা গেছে, ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু জনসংখ্যার মোট বৃদ্ধি হয় ২.৩৮ শতাংশ। সমীক্ষাভুক্ত ১০ টি গ্রামের প্রায় ৯৭ শতাংশ অধিবাসী ছিল হিন্দু। ফলে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই গ্রামগুলোর ক্ষেত্রে প্রজোয্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সেক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে ঐ ১০টি গ্রামের মোট জনসংখ্যা হয় ৩১৬১।

মাগুরখালী ইউনিয়নের অধিবাসীরা দেশ ত্যাগ করেছিল মূলত বাদুড়গাছি গণহত্যার (১৮ মে ১৯৭১) পর। ঐ দিন ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী বাদুড়গাছি গ্রামের প্রভাবশালী সরদার বাড়ির পাঁচজন গণহত্যার শিকার হন। এই সরদাররা ছিলেন পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের কাছে অনেকটা অভিভাবকের মতো। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে ডুমুরিয়া থানার অন্যান্য স্থানে যে লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু হয়েছিল, এই সরদারদের প্রভাবের কারণে বাদুড়গাছি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তা হয়নি। এদের নিহত হবার পরদিন থেকেই কাছাকাছি তিন-চারটি ইউনিয়নে ব্যাপক নির্যাতন ও লুণ্ঠন শুরু হয়ে যায়। ফলে এলাকার অধিবাসীরা দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।[১০]

হাসনাবাদ হলো ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার একটি থানা সদর। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে মাগুরখালী এলাকাটি প্রায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে হাসনাবাদ রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী স্থান প্রায় জনশূন্য প্রান্তর থেকে রাতারাতি শরণার্থীতে পূর্ণ হয়ে যায়। শরণার্থী অধ্যুষিত স্থানটি পরিচিত হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান 'জয় বাংলা' অনুসরণে 'জয় বাংলা বস্তি' নামে।

চিত্র ১ : ১৯৭১ সালে হাসনাবাদ রেল স্টেশনে বাংলাদেশি শরণার্থী। এটি তখন জয় বাংলা বস্তি নামে পরিচিত হয়েছিল।

কেস স্টাডি ১ : মাগুরখালী ইউনিয়ন

প্রধানত গণহত্যা ও শরণার্থী জীবনের দুর্দশার জন্য মাগুরখালী ইউনিয়নের অদিবাসীরা মানবিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল। একাত্তরের এপ্রিল-মে মাস থেকে স্থানীয় দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে এই বিপর্যয়ের সূচনা হয়। এর ফলে ইউনিয়নের অধিবাসীরা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে থাকে। মাগুরখালী ইউনিয়নের ঘুরুনিয়া গ্রামের শিবপদ মণ্ডল একাত্তরে তাঁর দেশত্যাগের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে তখনকার বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। স্থানীয় দুর্বৃত্তদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি বলেন :

> "যাদের চিনতাম তারা এমনভাবে কথাবার্তা বলল, যেন তাদের কাছে আমরা অপরিচিত। অথচ একসঙ্গে তারা বাবা কাকাদের সাথে ঘুরে বেড়িয়েছে। চাষের জমি আবাদ করেছে। কোন সমস্যা হলে একসঙ্গে মিটিং করেছে। কিন্তু তাদের উগ্র চেহারা দেখে মনে হবে আমরা তাদের চিরশত্রু ছিলাম। হায়রে আফসার চাচা! বুড়ো মানুষ লাঠি ভর দিয়ে এসেছে। আমার ঠাকুরদাকে দেখে কত সম্মান করত। আর আজ সকালে লাঠি উঁচু করে ঠাকুরদার সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। আফসার চাচা ঠাকুরদাকে বলে দিল, "কাকা, বাড়িটা আমরা রাজনীতির স্বার্থে দখল করে নেব।"[১১]

এরপর শিবপদ মণ্ডলের পরিবার দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সেই মূহূর্ত সম্পর্কে শিবপদ মণ্ডল বলেন,

> "বাড়ির চারিদিকে অসংখ্য লোক দেখে ভেবেছিলাম, আমাদের মেরে ফেলবে। এদের কেউ বাড়ির গরু–ছাগল দখলে নিচ্ছে, কেউ হাড়ি পাতিল নিয়ে যাচ্ছে। কয়েকজন অস্ত্র হাতে মুখ বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কয়েকজন অনেকগুলো বস্তা আমাদের বারান্দায় এনে রাখলো। বুঝলাম, আমাদের ধানের গোলা লুঠ হবে। একজন হঠাৎ চিৎকার করে বললো, 'এই শালার মালাওনের দল, এহনও বাড়ি ছাড়িসনি, জ্যান্ত কবর দেব সব!' তখনই সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সকালের রান্না করা ভাত হাড়িতেই রয়ে যায়। তক্ষুণি সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।"[১২]

কিন্তু দেশত্যাগ করার সময়ে এই ইউনিয়নের অনেকে পথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারায়। বিশেষত চুকনগর গণহত্যায় মাগুরখালী ইউনিয়নের অন্তত ৪১ জন প্রাণ হারায়। এই গণহত্যার শিকার হয়ে কিছু অধিবাসী দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে আবার গ্রামে ফিরে এসেছিল।[১৩] গ্রামে থেকে যাওয়া এই নগণ্য সংখ্যক মানুষ সাধারণত প্রাণ বাঁচানোর জন্য লুকিয়ে থাকতো। তারপরও রাজাকার ও স্থানীয় দুর্বৃত্তদের হাতে তাদের কয়েকজন খুন হয়। নিচের সারণি থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে।

সারণি ২
মাগুরখালীর শহিদদের তালিকা

সংখ্যা	নাম	পিতা	বয়স	গ্রাম	মৃত্যুর স্থান	হত্যাকারী
১.	রাজকৃষ্ণ সরকার	স্বরূপ সরকার	৪৫	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২.	মঙ্গল সরকার	রাজকৃষ্ণ সরকার	২০	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩.	মন্মথ রায়	ভরত রায়	৫৪	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৪.	প্রমিলা রায়	মন্মথ রায়	১২	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৫.	অশ্বিনী রায়	ফকির রায়	৫০	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৬.	নারায়ণ রায়	রামচরণ রায়	২০	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৭.	কালীপদ সানা	স্বরূপ সানা	৫৫	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৮.	গোবিন্দ সানা	কুশিলাল সানা	২৮	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৯.	বনমালী সানা	কুশিলাল সানা	২৫	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১০.	কুশিলাল সানা	পাঁচু সানা	৫৭	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১১.	হরেন্দ্রনাথ সানা	বিহারী সানা	৪০	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১২.	সুবোধ সানা	হরষিত সানা	৪২	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৩.	সুশীল সানা	বাগান সানা	১৯	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৪.	অনিল মণ্ডল	পঞ্চরাম মণ্ডল	২১	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৫.	পাচিদাসী রায়	অতুল রায়	৩৮	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৬.	অতুল মণ্ডল	দেবনাথ মণ্ডল	৫৫	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৭.	কালীপদ ঘোষ	নকুল ঘোষ	২৮	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৮.	জিতেন মণ্ডল	চুনিলাল মণ্ডল	৫৮	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
১৯.	পঞ্চানন মণ্ডল	শুকচাঁদ মণ্ডল	৩৬	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২০.	চুনিলাল মণ্ডল	নাম জানা যায়নি	---	শিবনগর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২১.	দেবেন রায়	কেশব রায়	২৬	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২২.	কেশব রায়	কালীচরণ রায়	৫০	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৩.	প্রফুল রায়	কালীচরণ রায়	৪৮	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৪.	কার্তিক রায়	কালীচরণ রায়	৪৫	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৫.	শিবপদ রায়	প্রিয়নাথ রায়	৪২	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৬.	নির্মল মণ্ডল	অভিরাম মণ্ডল	৩৬	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৭.	অভিরাম মণ্ডল	নাম জানা যায়নি	৫৭	আলাদীপুর	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৮.	নিশিকান্ত বালা	চণ্ডীচরণ বালা	৫৫	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
২৯.	ঠাকুরদাস বালা	বিজয় বালা	৫০	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩০.	কালীপদ বালা	সতীশ বালা	৪২	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩১.	প্রফুল মণ্ডল	যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল	৪০	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩২.	সাধু মণ্ডল	অরবিন্দ মণ্ডল	০৫	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা

৩৩.	গৌরপদ মণ্ডল	---	---	পূর্ব পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৪.	বিষ্ণুপদ মণ্ডল	সুরেন মণ্ডল	২০	পশ্চিম পাতিবুনিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৫.	বিনোদ সরকার	রাজমোহন সরকার	৬৫	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৬.	নিমাই সরকার	গোবর্দ্ধন সরকার	৪০	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৭.	রাজমোহন সরদার	শীতল সরদার	৮০	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৮.	হরিপদ সানা	শিবরাম সানা	৭০	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৩৯.	বিরেন মণ্ডল	কান্তরাম মণ্ডল	৫৬	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৪০.	অনিল মণ্ডল	স্বরূপ মণ্ডল	২৮	কাঠালিয়া	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৪১.	জগবন্ধু গোলদার	মধুসূদন গোলদার	৫৫	মাগুরখালী	চুকনগর	পাকিস্তানি সেনা
৪২.	চৈতন্য মলিক	নেপাল মলিক	৫৫	মাগুরখালী	কপিলমুনি	রাজাকার/স্থানীয় দুর্বৃত্ত
৪৩.	বিনোদ বিহারী মোহন্ত	রাজেন্দ্রনাথ মোহন্ত	৫৫	কাঞ্চন নগর	বদরতলা	রাজাকার/স্থানীয় দুর্বৃত্ত
৪৪.	অনিল রায়	নিমাইচাঁদ রায়	৩০	কাঞ্চন নগর	সুন্দরমহল	রাজাকার/স্থানীয় দুর্বৃত্ত
৪৫.	ভগবান রায়	গগন রায়	৫৮	আমুড়বুনিয়া	বারুইকাঠি	রাজাকার/স্থানীয় দুর্বৃত্ত
৪৬.	মহেন্দ্রনাথ মুণি (মুক্তিযোদ্ধা)	যদুবর মুণি	৪৫	নাথেরকুড়	ঘোষনগর	রাজাকার/স্থানীয় দুর্বৃত্ত

উৎস : ২০১১ সালে গবেষকের করা মাঠ সমীক্ষা।

সারণি ২ থেকে দেখা যায়, মাগুরখালী ইউনিয়নের অন্তত নয়টি গ্রামের অধিবাসীরা তখন গণহত্যার শিকার হয়। এছাড়া নির্যাতন ও লুণ্ঠনের শিকার হয় প্রতিটি গ্রাম। দেশত্যাগ করার পরে এখানকার অধিবাসীরা গণহত্যা ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্ত তাতে তাদের প্রাণ রক্ষার নিশ্চয়তা তৈরি হয় না। ভারতের শরণার্থী শিবিরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতার কারণে বহু মানুষ সেখানে মৃত্যুবরণ করে। বস্তুত, গণহত্যার কারণে মাগুরখালী ইউনিয়নের যতো মানুষ খুন হয়েছিল, শরণার্থী জীবনে তারও বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। মাঠ সমীক্ষা থেকে এই ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের অধিবাসীদের শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুর হার জানা যায়। নিচের সারণিতে সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩

শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুবরণকারী মাগুরখালী ইউনিয়নের শরণার্থী

সংখ্যা	নাম ও বয়স	পিতার নাম	গ্রাম	শরণার্থী শিবির	মৃত্যুর কারণ
১.	আরতি মণ্ডল (০৭)	গৌর মণ্ডল	পূর্ব পাতিবুনিয়া	মানা	কলেরা
২.	রমেশ মণ্ডল (১০)	গৌর মণ্ডল	ঐ	বারাশাত	কলেরা
৩.	অভয়চরণ বালা (৫৩)	নবীন চন্দ্র বালা	ঐ	গয়া	কলেরা
৪.	ভজন বালা (৬৬)	নবীন চন্দ্র বালা	ঐ	গয়া	কলেরা
৫.	রঞ্জিতা বালা (০৫)	অভয়চরণ বালা	ঐ	গয়া	কলেরা
৬.	কার্তিক বালা (০৬)	জগন্নাথ বালা	ঐ	গয়া	কলেরা
৭.	পঞ্চানন বালা (০৮)	বিনোদ বালা	ঐ	গামারবুনিয়া	কলেরা

৮.	মঞ্জুলিকা বালা (০৫)	বিলাস বালা	ঐ	গামারবুনিয়া	কলেরা
৯.	পাঁচু মণ্ডল (০৬)	রাধাকান্ত মণ্ডল	ঐ	পঞ্চাননপুর	কলেরা
১০.	বনিতা বিশ্বাস (০৬)	হরিপদ বিশ্বাস	ঐ	ব্যাকি	কলেরা
১১.	সুফলা বালা (০৫)	শুকলাল বালা	ঐ	জগন্নাথপুর	কলেরা
১২.	মুক্তরাম মণ্ডল (৭৭)	সীতেরাম মণ্ডল	পশ্চিম পাতিবুনিয়া	মানাভাটা	কলেরা
১৩.	কামিনীদাসী মণ্ডল (৭০)	গোবিন্দ মণ্ডল	ঐ	বারাশত	কলেরা
১৪.	মহাদেব মণ্ডল (০৫)	ফণিন্দ্রনাথ মণ্ডল	ঐ	মানাভাটা	কলেরা
১৫.	মঞ্জু রায় (০৫)	নিতাই রায়	ঐ	মেদিনীপুর	কলেরা
১৬.	মালতি সরদার (০৫)	প্রফুল সরদার	ঐ	সল্টলেক	কলেরা
১৭.	আহ্লাদি সরদার (৭০)	বাঁশিরাম মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	কলেরা
১৮.	হাজরাপদ রায় (০৫)	জ্যোতিষ রায়	ঐ	নীলগঞ্জ	কলেরা
১৯.	রানী সানা (০৫)	মনোরঞ্জন সানা	ঐ	গোবিন্দপুর	কলেরা
২০.	নিবারন মণ্ডল (৮০)	প্রহ্লাদ মণ্ডল	কাঠালিয়া	গামারবুনিয়া	কলেরা
২১.	গোলাপী মণ্ডল (৭০)	শ্যামাচরণ	ঐ	মানাভাটা	কলেরা
২২.	পাঁচীদাসী সরকার (৭৮)	যুধিষ্ঠির বৈদ্য	ঐ	মানাভাটা	কলেরা
২৩.	সুনীল মণ্ডল (২০)	বিপিন মণ্ডল	ঐ	মানাভাটা	কলেরা
২৪.	নিখিল সরকার (০৬)	অভিমন্যু সরকার	ঐ	মানাভাটা	কলেরা
২৫.	সত্যবতী মণ্ডল (৭০)	উত্তম গোলদার	ঐ	নওগা	কলেরা
২৬.	নীলু মণ্ডল (১০)	ননীগোপাল মণ্ডল	ঐ	নওগা	কলেরা
২৭.	সুভাষ মণ্ডল (০৭)	ননীগোপাল মণ্ডল	ঐ	নওগা	কলেরা
২৮.	সুমতি মণ্ডল (০৫)	হরিদাস মণ্ডল	ঐ	কুরুথ	কলেরা
২৯.	পঞ্চানন রায় (৫৭)	রাজেন্দ্র রায়	ঐ	স্বরূপনগর	কলেরা
৩০.	পাচিদাসী রায় (৪৩)	ফুলচাঁদ মণ্ডল	ঐ	স্বরূপনগর	কলেরা
৩১.	ঊষা রায় (০৮)	পঞ্চানন রায়	ঐ	স্বরূপনগর	কলেরা
৩২.	সুকুমার রায় (০৬)	পঞ্চানন রায়	ঐ	স্বরূপনগর	কলেরা
৩৩.	ব্রজলাল সানা (৬৬)	শিবরাম সানা	ঐ	নওগা	কলেরা
৩৪.	নির্মলা সানা (৪৭)	রাজেন্দ্র সানা	ঐ	নওগা	কলেরা
৩৫.	ব্যালতা সানা (৭৬)	ত্রৈলোক্য সানা	ঐ	নওগা	কলেরা
৩৬.	তুলসী মলিক (০৫)	রামপদ মলিক	ঐ	সল্টলেক	কলেরা
৩৭.	নমিতা সানা (৭০)	দ্বারিক সরদার	ঐ	সল্টলেক	কলেরা
৩৮.	বিধান সানা (১০)	দুলাল সানা	ঐ	সল্টলেক	কলেরা
৩৯.	মায়া রানি সরকার (০৬)	যোগেন্দ্র সরকার	মাগুরখালী	নওগা	জ্বর
৪০.	ইছামতি মণ্ডল (৬৫)	ভজহরি মণ্ডল	ঐ	নওগা	অপুষ্টি
৪১.	সুভদ্রা মণ্ডল (৪৫)	ভূপেন মণ্ডল	ঐ	নওগা	গ্যাস্ট্রিক
৪২.	সরো রানী মণ্ডল (৫৫)	ফকির মণ্ডল	ঐ	নওগা	বাতজ্বর
৪৩.	প্রলয় বাইন (০৪)	হাজরা বাইন	ঐ	বশিরহাট	পেটব্যথা

৪৪.	কাঞ্চন সরকার (৬৭)	হরেন্দ্র সরকার	ঐ	বশিরহাট	হাম
৪৫.	টুপলি সরকার (৬২)	প্রহ্লাদ সরকার	ঐ	নওগা	বসন্ত
৪৬.	পঁচা সরকার (০৬)	চণ্ডীচরণ সরকার	ঐ	নওগা	আমাশয়
৪৭.	পুটু সরকার (০৪)	চণ্ডীচরণ সরকার	ঐ	নওগা	আমাশয়
৪৮.	গান্ধারী মণ্ডল (৬৫)	পঞ্চরাম মণ্ডল	ঐ	নওগা	টি.বি.
৪৯.	ভগবান মণ্ডল (৩৩)	সনাতন মণ্ডল	ঐ	নওগা	ট্রমা
৫০.	রাজেন্দ্র মণ্ডল (৫০)	বসন্ত মণ্ডল	ঐ	পাঁচপোতা	ট্রমা
৫১.	সরস্বতী মণ্ডল (৪২)	সন্তোষ মণ্ডল	ঐ	পাঁচপোতা	টি.বি.
৫২.	বাবুরাম মণ্ডল (৬৩)	গৌর মণ্ডল	ঐ	কুরুথ	অপুষ্টি
৫৩.	তারা রানি মণ্ডল (৪৫)	জ্যোতিষ মণ্ডল	ঐ	পাঁচপোতা	টি.বি.
৫৪.	কামিনী মোহন্ত (৪৫)	মতিলাল মোহন্ত	কাঞ্চন নগর	সল্টলেক	আমাশয়
৫৫.	নির্মল মোহন্ত (২৫)	রামলাল মোহন্ত	ঐ	সল্টলেক	আঘাত
৫৬.	সরস্বতী মোহন্ত (৭০)	রাজেন্দ্র মোহন্ত	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৫৭.	রঙ্গদাসী মণ্ডল (৫৮)	রাজকুমার মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	ট্রমা
৫৮.	সুনীল মণ্ডল (০৮)	কালীপদ মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৫৯.	রঞ্জিতা সরকার (০৩)	গুরুচরণ সরকার	ঐ	বারাশাত	জ্বর
৬০.	লক্ষ্মী রানি সরদার (৭০)	পাঁচু সরদার	ঐ	সল্টলেক	জ্বর
৬১.	অনাদী মণ্ডল (০৬)	নগেন মণ্ডল	চণ্ডীপুর	সল্টলেক	জ্বর
৬২.	মাধব মণ্ডল (৫৩)	উমেশ মণ্ডল	ঐ	রানাঘাট	আঘাত
৬৩.	বাঁশিরাম মণ্ডল (৫০)	দ্বারিক মণ্ডল	ঐ	দমদম	ট্রমা
৬৪.	সুশান্ত মণ্ডল (০৩)	নির্মলকান্তি মণ্ডল	ঐ	গোপালপুর	আমাশয়
৬৫.	স্বরূপ মল্লিক (৭৪)	চন্দ্রকান্ত মল্লিক	ঐ	সল্টলেক	ট্রমা
৬৬.	সরস্বতী মণ্ডল (৪৫)	অশ্বিনী মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	বসন্ত
৬৭.	হিমাংশু বাছাড় (০৩)	মনোহর বাছাড়	ঐ	সাহারা	আমাশয়
৬৮.	ঠাণ্ডা মণ্ডল (৫০)	সারদা মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৬৯.	ময়না মণ্ডল (০৯)	সখিচরণ মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৭০.	পঞ্চানন বালা (৬২)	পাঁচুরাম বালা	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৭১.	সরস্বতী বালা (৪২)	পঞ্চানন বালা	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৭২.	পারবল বালা (৪৫)	নিমাই বালা	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৭৩.	খাইরবল বালা (০৮)	পঞ্চানন বালা	ঐ	সল্টলেক	আমাশয়
৭৪.	রঞ্জিতা মণ্ডল (০২)	নগেন মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	জ্বর
৭৫.	কাঞ্চন মণ্ডল (৫৮)	অভিলাষ মণ্ডল	ঐ	রানাঘাট	বসন্ত
৭৬.	হাজারীলাল বাইন (৬৫)	কনেক বাইন	ঝরঝরিয়া	বারাশাত	আমাশয়
৭৭.	রবহিদাস বাইন (০৭)	হাজারীলাল বাইন	ঐ	বারাশাত	আমাশয়
৭৮.	হাজারী সানা (৭২)	ফটিক সানা	ঐ	বর্ধমান	আমাশয়
৭৯.	সতীশ সানা (১.৫)	ধীরেন সানা	ঐ	মেদিনীপুর	আমাশয়

৮০.	মণীন্দ্র বাইন (০৪)	নাম জানা যায়নি	ঐ	বারাশাত	আমাশয়
৮১.	সরলা সরকার (৪৫)	নিরাপদ সরকার	ঐ	স্বরূপনগর	গা ফুলো
৮২.	অমর সরকার (০.৫)	নিরাপদ সরকার	ঐ	হার্দুয়া	আমাশয়
৮৩.	লক্ষ্মী রায় (২০)	রসময় রায়	ঘুরবনিয়া	মানা	কলেরা
৮৪.	প্রশান্ত মণ্ডল (০৩)	গোলক মণ্ডল	ঐ	সল্টলেক	অপুষ্টি
৮৫.	রাজকুমার রায় (৬৫)	চন্দ্রকান্ত রায়	ঐ	নওগা	আমাশয়
৮৬.	সুভাষ মণ্ডল (০৭)	কৃষ্ণপদ মণ্ডল	ঐ	নওগা	কলেরা
৮৭.	যমুনা মণ্ডল (০৫)	কৃষ্ণপদ মণ্ডল	ঐ	নওগা	অপুষ্টি
৮৮.	প্রভাত মণ্ডল (০৩)	কৃষ্ণপদ মণ্ডল	ঐ	নওগা	অপুষ্টি
৮৯.	বাসন্তী মণ্ডল (০১)	কৃষ্ণপদ মণ্ডল	ঐ	নওগা	আমাশয়
৯০.	খুকুমণি বৈরাগী (০৩)	অজিত বৈরাগী	চিত্রামারী	মেদিনীপুর	কলেরা
৯১.	সাজু রায় (০৫)	প্রফুল্ল রায়	ঐ	আমপাড়া	কলেরা
৯২.	রেবা মণ্ডল (০২)	অখিল মণ্ডল	ঐ	কেওসা	কলেরা
৯৩.	দিলীপ মণ্ডল (০৪)	নিখিল মণ্ডল	ঐ	কেওসা	কলেরা
৯৪.	সুনিতা মণ্ডল (০২)	নিখিল মণ্ডল	ঐ	কেওসা	কলেরা
৯৫.	পাঁচু মণ্ডল (০৩)	অনিল মণ্ডল	ঐ	সরুলিয়া	আঘাত
৯৬.	রবীন মণ্ডল (০৫)	কালীপদ মণ্ডল	ঐ	ধর্মতলা	কলেরা
৯৭.	ভাদ্দরী সরকার (৫৫)	মহাদেব সরকার	ঐ	গোবিন্দপুর	কলেরা
৯৮.	রাজেন্দ্র বৈরাগী (৭৫)	পারশ বৈরাগী	গজালিয়া	অশোকনগর	কলেরা
৯৯.	খুকু রানি বৈরাগী	মণীন্দ্র বৈরাগী	ঐ	বৃন্দাবন	কলেরা
১০০.	কালীচরণ সানা (৮১)	বিদুর সানা	ঐ	অশোকনগর	কলেরা
১০১.	পারবল সানা (৩৮)	শম্ভুনাথ রায়	ঐ	মানা	কলেরা
১০২.	স্বপন সানা (১২)	অতুল কৃষ্ণ সানা	ঐ	মানা	কলেরা
১০৩.	বিপাশা সানা (০১)	অতুল কৃষ্ণ সানা	ঐ	মানা	কলেরা
১০৪.	আরতি বৈরাগী (১২)	কালীপদ বৈরাগী	ঐ	কেওসা	কলেরা
১০৫.	সুধন্য বৈরাগী (৬০)	শিশুবর বৈরাগী	ঐ	অশোকনগর	কলেরা
১০৬.	খোকন বৈরাগী (০৬)	সুধন্য বৈরাগী	ঐ	অশোকনগর	কলেরা
১০৭.	পাচি বৈরাগী (৭২)	নাম জানা যায়নি	ঐ	অশোকনগর	কলেরা
১০৮.	পচি বৈরাগী (৪০)	হরিশ বৈরাগী	ঐ	অশোকনগর	কলেরা

উৎস : ২০১১ সালে গবেষকের করা মাঠ সমীক্ষা।

সারণি ৩ থেকে দেখা যায়, ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের শরণার্থীদের মধ্যে ১০৮ জন মৃত্যুবরণ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ঐ দশটি গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ৩১৬১ জন। এর মধ্যে শুধু শরণার্থী শিবিরে মারা যায় ১০৮ জন। অর্থাৎ গড়ে ছয় মাস (জুন থেকে নভেম্বর) সময়ে শরণার্থী শিবিরে ঐ গ্রামগুলোর ৩.৪২% মানুষ মারা যায়।

১৯৬১ সালে মাগুরখালী ইউনিয়নের জনসংখ্যা ছিল ৬৩০০ জন।[১৪] ১৯৭১ সালে ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এই সময়ে ইউনিয়নের মোট অনুমিত জনসংখ্যা ৭০০০ ধরলে এবং সমীক্ষায় প্রাপ্ত ১০টি গ্রামের শরণার্থী মৃত্যুর হার অনুসরণ করলে সমগ্র ইউনিয়নে মোট মৃত্যুবরণকারী শরণার্থী হয় ২৩৯ জন। সারণি ২ থেকে দেখা গেছে যে, গণহত্যায় এই ইউনিয়নের অন্তত ৪৬ জন প্রাণ হারিয়েছিল। অর্থাৎ গণহত্যা এবং শরণার্থী শিবির মিলিয়ে এই ইউনিয়নে অন্তত ২৮৫ জন মানুষ নিহত হয়েছিল, শতকরা হিসেবে যা মোট অধিবাসীর ৪.০৭%। গণহত্যা ও শরণার্থী শিবিরে মৃত্যুবরণকারীদের সংখ্যা একত্র করলে চিত্রটি হয় নিম্নরূপ :

সারণি ৪

মুক্তিযুদ্ধে নিহত মাগুরখালী ইউনিয়নের অধিবাসী

নিহতের কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার
গণহত্যা	৪৬	০.৬৫%
শরণার্থী শিবিরের দুর্দশা	২৩৯	৩.৪২%
মোট নিহত	২৮৫	৪.০৭%

সারণি ৪ থেকে নিহতের যে সংখ্যা পাওয়া যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবিক বিপর্যয়ের তা এক আংশিক রূপ মাত্র। ইউনিয়নের প্রায় ৯৫ শতাংশ পরিবারের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি এ সময়ে লুণ্ঠিত হয়।[১৫] বেশ কিছু নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে। ঘুরুনিয়া ও পশ্চিম পাতিবুনিয়া গ্রামের দুজন নারীকে পার্শ্ববর্তী এলাকার দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে প্রায় দশদিন আটকে রেখেছিল।[১৬] যে অল্প কয়েকজন মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামে পালিয়ে অবস্থান করছিল, তাদের কয়েকজনের জোরপূর্বক ধর্মান্তরও করা হয়। ইউনিয়নের লাঙলমোড়া গ্রামের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। শান্তিরাম সাধু নামক ঐ গ্রামের একজন অধিবাসী ভারতে না গিয়ে দেশে থেকে গিয়েছিলেন। ঐ এলাকায় তার বেশকিছু জমিজমাও ছিল। এই খবর রাজাকাররা জানতে পারে এবং তার জমি দখল করার পায়তারা করতে থাকে। একপর্যায়ে রাজাকাররা তাকে হুমকি দেয়, 'পাকিস্তানে থাকতে গেলে মুসলমান হয়েই থাকতে হবে, নইলে পরিণতি হলো মৃত্যু'। প্রাণভয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিয়মিত নামাজ পড়তে থাকেন।[১৭]

শরণার্থী শিবিরে মানবিক বিপর্যয় ছাড়াও সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নেমে এসেছিল বহুমুখী বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের একটি নমুনা হিসেবে ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের জিতেন্দ্রনাথ সানার পরিবারটির শরণার্থী জীবন আলোচনা করা হলো।

জিতেন্দ্রনাথ সানার পরিবার (শিবনগর, মাগুরখালী, ডুমুরিয়া, খুলনা, বাংলাদেশ)

শিবনগর গ্রামের জিতেন্দ্রনাথ সানা ও গুরুদাসী সানা দম্পতির পরিবার ১৯৭১ সালের মে মাসে ভারতে চলে যায়। এই দম্পতির সাথে ছিল তাঁদের দুইটি সন্তান কালী রানি সানা এবং প্রশান্ত সানা। শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণের কিছুদিন পরে কালী রানির সাথে পার্শ্ববর্তী আরেকটি শিবিরের

শরণার্থী কৃষ্ণপদ রায়ের বিবাহ হয়। দেশে থাকতেই সম্বন্ধ ঠিক করা ছিল। এই সময়ে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য প্রদেশে শরণার্থী সরিয়ে নিচ্ছিল। কৃষ্ণপদ রায়ের পারিবারের উত্তর প্রদেশে চলে যাওয়ার নির্দেশ আসে। ফলে বিয়ের ঠিক পরদিন কৃষ্ণপদ রায়ের সাথে কালী উত্তর প্রদেশে চলে যায়। জিতেন্দ্রনাথের পরিবার শুধু জানতো, তাঁদের মেয়ে-জামাই উত্তর প্রদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে যাচ্ছে। কিন্তু ক্যাম্পের কোনো ঠিকানা তাদের জানা ছিল না। কিছুদিন পরে জিতেন্দ্রনাথ দম্পতি মধ্য প্রদেশের একটি শরণার্থী ক্যাম্পে প্রতিস্থাপিত হন। এরপর কন্যা কালীর সাথে তাদের বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী রূপ নেয়। ভারত সরকার শরণার্থীদের জন্য বিনামূল্যে জমি দিচ্ছে, লোকমুখে এমন একটি খবর শুনে জিতেন্দ্রনাথ মধ্য প্রদেশ থেকে চলে যান অন্ধপ্রদেশের আদিলাবাদ জেলায়। সেখানে তিনি কাগজনগর এলাকার একটি শরণার্থী কলোনিতে বসবাস করতে থাকেন।[১৮] দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জিতেন্দ্রনাথের পরিবার আর দেশে ফিরে আসেননি। বর্তমানে তাঁর সেই শরণার্থী শিশুপুত্র প্রশান্ত সানা সেখানেই সপরিবারে বসবাস করছেন।[১৯]

অন্যদিকে কালী রানিও দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আর দেশে ফিরে আসেননি। স্বামী কৃষ্ণপদর সাথে পরিবার নিয়ে স্থায়ী হয় উত্তর প্রদেশের পিলিবিড জেলায়। সেখানে বর্তমানে (২০১৪) চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তার পরিবার জীবন অতিবাহিত করছে। এই দুই পরিবারের সাথে কখনও আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। কালী রানির পিতা-মাতা তাঁদের জীবদ্দশাতে হারিয়ে যাওয়া এই মেয়ের কোনো খোঁজ পাননি।[২০] মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস এমন অনেক চির বিচ্ছেদের জন্ম দিয়েছে? সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ এক বিস্ময়কর বিপর্যয় বৈকি!

কেস স্টাডি ২ : হাসনাবাদ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতের যেসব এলাকা সর্বপ্রথম শরণার্থীতে পূর্ণ হয়ে যায়, হাসনাবাদ তার অন্যতম। তৎকালীন চব্বিশ পরগণা জেলার শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর তালিকায় এই ক্যাম্পটির নাম রয়েছে প্রথমে।[২১] সাতক্ষীরা সীমান্তের পশ্চিমে মাত্র এক কিলোমিটারের মধ্যে হাসনাবাদের অবস্থান হওয়ায় এপ্রিল মাস থেকেই এখানে শরণার্থী অনুপ্রবেশ শুরু হয়ে যায়। মে মাসের শেষার্ধে হাসনাবাদ রেল স্টেশন সংলগ্ন ফাঁকা জায়গা শরণার্থীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। রেল স্টেশন সংলগ্ন জয় বাংলা বস্তিতে সেসময় আনুমানিক ৩০০০ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা যায়।[২২] রেল স্টেশন থাকায় স্থানটি সে সময়ে শরণার্থী ট্রানজিট রুটে পরিণত হয়েছিল। ফলে সব সময়ই এখানে ভিড় ও জনদুর্ভোগ লেগে থাকতো। শরণার্থীরা এখানে খড়, বাঁশ, গাছের ডালপালা ব্যবহার করে যে অস্থায়ী আবাস নির্মাণ করেছিল (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য), সেই ঘরগুলোই পরবর্তী কালে জয় বাংলা বস্তিতে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী দুই-তিন বছর এখানে অন্তত বিশটি শরণার্থী পরিবার থেকে গিয়েছিল বলে জানা যায়। এরা সকলেই ছিল তৎকালীন বৃহত্তর খুলনা জেলার বাসিন্দা।[২৩]

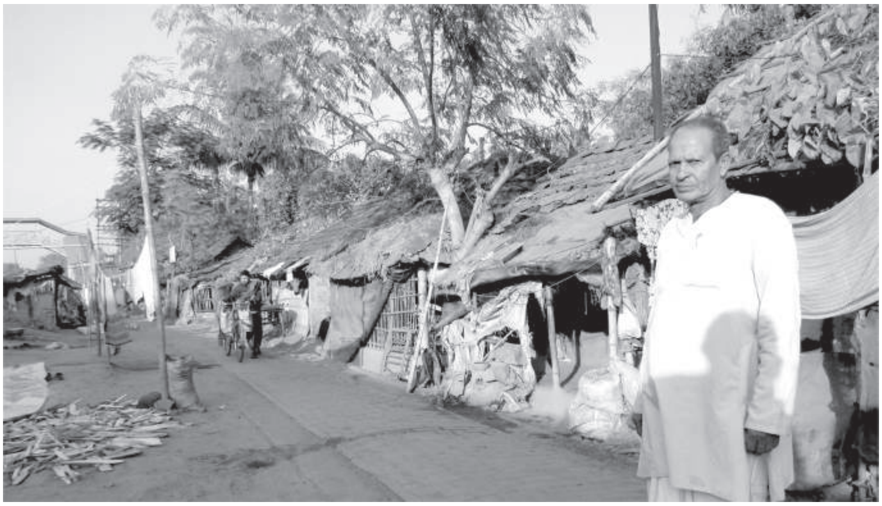

চিত্র ২ : ২০১৪ সালে জয় বাংলা বস্তি/কলোনি। কলোনির সভাপতি কার্তিক ব্যানার্জীর সাথে বস্তির চিত্র (২০১৪ খ্রি.)

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মাঠ সমীক্ষার সময়ে এই বস্তিতে অন্তত চারটি পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা ছিল ১৯৭১ সালের শরণার্থী। কয়েকটি শরণার্থী পরিবার ঐ বস্তি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে বলেও জানা যায়। সমীর সরকার ও রতন মাঝি নামক দুইজন শরণার্থীর পরিবার তখনও (২০১৪ খ্রি.) বস্তিতে বাস করছিল। এর মধ্যে সমীর সরকার মৃত্যুবরণ করায় তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব ছিল না। নিম্নে রতন মাঝির জীবনের মানবিক বিপর্যয়ের ঘটনা বর্ণনা করা হলো।

রতন মাঝির পরিবার (হাসনাবাদ, জয়বাংলা বস্তি, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

রতন মাঝির জন্ম হয়েছিল খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বাগালী ইউনিয়নের বামিয়া নামক গ্রামে। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান। কৃষিকাজ, মাছধরা, মাদুর বোনা ও শ্রম বিক্রি করা ছিল এই পরিবারটির পেশা। রাজনীতির সাথে রতন মাঝির পরিবারের কোনো সংশ্রব ছিল না। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্থানীয় দুর্বৃত্তদের লুঠপাট আর সন্ত্রাসের কারণে তিনি দেশত্যাগ করে কিছুদিন হাসনাবাদ রেল স্টেশনে আশ্রয় নেন। এরপর সেখান থেকে চলে যান কলকাতার সন্নিকটে সল্টলেক শরণার্থী শিবিরে। সল্টলেকে তিনি ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করেন। ডিসেম্বরে দেশ মুক্ত হলে তিনি ও তার পরিবার কয়রায় গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। কিন্তু গ্রামে ফিরে দেখেন, বাড়িঘর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, রাজাকাররা তার বাড়িঘর সব লুঠ করে নিয়ে গেছে। এলাকায় তখন চরম খাদ্যাভাব, শ্রম বিক্রি করার মতো কোনো জায়গা নেই। অন্যদিকে লুণ্ঠিত মালামালের মালিক হয়ে রাজাকাররা তখন স্বাচ্ছন্দ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। রতন

মাঝিকে রাজাকাররা মাঝে মাঝে বলতো, "চলে গিয়েছিলে, আবার ফিরে আসলে কিসের আশায়? এখনও সময় আছে, চলে যাও।"

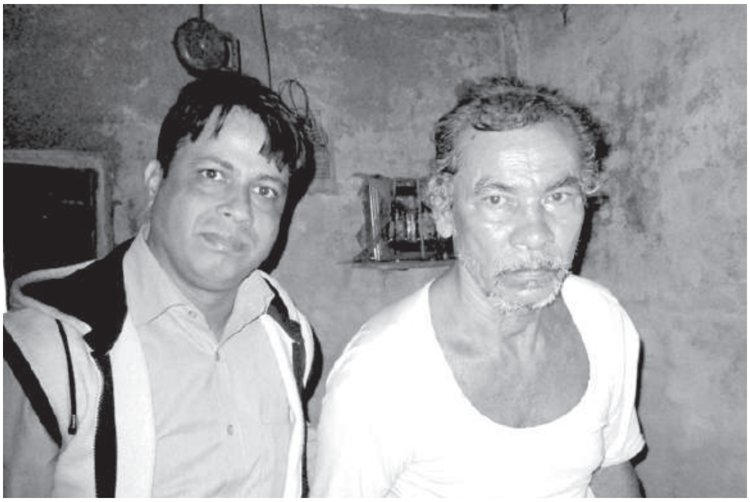

চিত্র ৩ : জয় বাংলা বস্তিতে রতন মাঝির সাথে গবেষক (২০১৪ খ্রি.)

এভাবে নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হয়ে তিনি দুই-মাস নিজ গ্রামে থেকে আবার ভারতে চলে যান। ততদিনে ভারতে শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।[২৪] ফলে তাদের জন্য ভারতের পক্ষ থেকে তখন কোনো সাহায্য বা সহানুভূতি ছিল না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি আশ্রয় নেন হাসনাবাদ রেল স্টেশনের জয় বাংলা বস্তিতে। প্রথমে সেখানে রাস্তার পাশে একটি কুঁড়ে বেঁধে পরিবার নিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সেই সময় থেকে নিরক্ষর ও শ্রমজীবী এই মানুষটি তার পরিবার নিয়ে ঐ বস্তিতে বাস করছেন (২০১৪ খ্রি.)।[২৫]

হাসনাবাদের কিছু ঘটনা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।[২৬] বিশেষত পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নারীদের উপরে যে পাশবিক নির্যাতন হচ্ছে, তার কিছু প্রমাণ হাসনাবাদে মেলে। শরণার্থী শিবিরে সেবামূলক কাজে ব্যাপৃত ফাদার হ্যাস্টিংস নামক এক যাজকের বর্ণনায় এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। হাসনাবাদে দায়িত্ব পালন করার সময়কার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, "যেসব মহিলা ধর্ষণের [পাকিস্তানি সেনা অথবা তাদের সহযোগীদের দ্বারা] ফলে গর্ভবতী হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে হাসনাবাদে গাছের ডালে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। অন্যরা গর্ভপাত ঘটায়। আর যারা গর্ভপাত ঘটাতে ব্যর্থ হয় তারাও আত্মহত্যা করে।"[২৭]

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এবং এর অব্যবহিত আগে ও পরে যে বহুমুখী ধারার মানবিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল, উপরের আলোচনা তার একটি প্রক্ষেপণ মাত্র। এই আলোচনা থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিপুল মানবিক অভিঘাত সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশের অভ্যন্তরে গণহত্যা ও অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধে যেমন বহু মানুষকে প্রাণ দিতে হয়, দেশত্যাগ করে ভারতে যাওয়ার পরে সেখানকার বিপর্যয়কর পরিবেশেও অসংখ্য মানুষকে প্রাণ দিতে হয়। সন্দেহ নেই, বিপুল এই মানবিক বিপর্যয় ও প্রাণের মূল্যে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করা মানুষের এই আত্মদান স্বভাবতই পরিবার ও সমাজে এক মর্মন্তুদ অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতার চার যুগ পরেও অসংখ্য সাধারণ মানুষ সে অভিঘাতের ফল বয়ে বেড়াচ্ছেন।

অন্তটীকা

১. মাগুরখালী ও পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে মাঠ সমীক্ষা থেকে এই তথ্য জানা গেছে। এছাড়া দেখুন শিবপদ মন্ডল, অন্তঃক্ষরণ (ঢাকা : চন্দ্রছাপ প্রকাশনী, ২০১৪), পৃঃ. ১২।

২. ভাবানুবাদ লেখকের। মূল ইংরেজি : "Owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside of the country of his former habitual residence, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it. "www.unhcr.org.au/basicdef.shtml, accessed on 6 August 2009.

৩. *Encyclopedia of Britanica* (1981), s.v. "Refugee."

৪. অনুবাদ লেখকের। মূল টেক্সট : "A Refugee is : a. Any person who is outside his or her country is unable or unwilling to return to, and is unable or unwilling to avail himself or herself of the protection of that country because of well founded fear of persecution on account of race, religion, sex, nationality, ethnic identity, membership of a particular social group or political opinion, or, b. Any person who owing to external aggression, occupation, foreign domination, serious violation of human rights or other events seriously disrupts public order in either part or whole of his or her country of origin, is compelled to leave his or her place of habitual residence in order to seek refugee in another place outside his or her country." কর্মশালায় গৃহীত এই সংজ্ঞাটির জন্য দ্রষ্টব্য, Udbastu, Issue 3, December 1997 (Dhaka: 1997), pp. 2-3.

৫. হাসান হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪), পৃঃ. ৬৯০।

৬. এছাড়া ১৯৬১ সালে বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিবাসী ছিল ৫,৭০,০০০ জন; ১৯৭৪ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,৬৬,০০০ জনে।

৭. Kalyan Chaudhuri, *Genocide in Bangladesh* (Kolkata, Orient Longman, 1972), p. 77.

৮. ২০১১ সালে মাগুরখালী ইউনিয়নে প্রাবন্ধিকের করা একটি মাঠ সমীক্ষায় শরণার্থীদের এই হার জানা যায়।

৯. ১৯৬১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টের জেলা সিরিজ (খুলনা)।

১০. এই গণহত্যায় পুলিন সরদার, দয়াল সরদার, অনন্ত সরদার, বিষ্ণুপদ সরদার ও পদ্মরানি সরদার নিহত হন। সাক্ষাৎকার, রণজিৎ সরদার (ভাইস চেয়ারম্যান, ডুমুরিয়া উপজেলা, খুলনা), ৮ ডিসেম্বর ২০১০।

১১. শিবপদ মণ্ডল, *প্রাগুক্ত*।

১২. সাক্ষাৎকার, শিবপদ মণ্ডল (ঘুরুনিয়া, ডুমুরিয়া), ২৯ মার্চ ২০১৫।

১৩. পার মাগুরখালী গ্রামের হরিপদ মণ্ডল চুকনগর গণহত্যা থেকে বেঁচে গিয়ে আবার গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। সাক্ষাৎকার, হরিপদ মণ্ডল (পার মাগুরখালী, ডুমুরিয়া, খুলনা), ৪ আগস্ট ২০১৫।

১৪. ১৯৬১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টের জেলা সিরিজ (খুলনা)।

১৫. এসব পরিবারের যাবতীয় গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, পুকুরের মাছ, গোলার ধান, হাড়ি কড়াই-সহ যাবতীয় তৈজসপত্র, গৃহস্থালীর আসবাব, নিত্য ব্যবহার্য পারিবারিক দ্রব্যাদি, নৌকা, গাছের ফল, কৃষি যন্ত্রপাতি এমনকি ঘরের দরজা-জানালা প্রভৃতি এ সময়ে লুঠ হয়ে যায়। পাশাপাশি কিছু স্থাবর সম্পত্তিও বেদখল হয়ে যায়।

১৬. এই দুই নারী বার্ধক্যজনিত কারণে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের নাম পরিচয় গোপন রাখা হলো।

১৭. সাক্ষাৎকার, বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (তালা, সাতক্ষীরা), ১১ ডিসেম্বর ২০১৫। হীরামোহন সরকার (মাগুরখালী, ডুমুরিয়া), ২১ মে ২০১৪।

১৮. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য এই কলোনি তৈরি করে।

১৯. ২০০৫ সালে প্রশান্ত সানা তার মাতা গুরুদাসী সানার সাথে জন্মভূমি শিবনগর গ্রামে বেড়াতে আসলে গবেষক তার সাক্ষাৎকার নেন। সাক্ষাৎকার, প্রশান্ত সানা (আদিলাবাদ, কাগজনগর অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারত), ২২ নভেম্বর ২০০৫।

২০. সাক্ষাৎকার, গুরুদাসী সানা (আদিলাবাদ, কাগজনগর অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারত), ২২ নভেম্বর ২০০৫।

২১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪), পৃঃ ৬৯১।

২২. সাক্ষাৎকার, কার্তিক ব্যানার্জী (সভাপতি, জয় বাংলা কলোনি, হাসনাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪। রেল স্টেশন সংলগ্ন জয় বাংলা বস্তিতে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের কোনো সরকারি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

২৩. সাক্ষাৎকার, রতন মাঝি (জয় বাংলা কলোনি, হাসনাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪।

২৪. ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী প্রত্যার্পণ সম্পন্ন হয়। ফলে ত্রাণ কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যায়।

দেখুন, K. C. Saha, "The genocide of 1971 and the refugee influx in the east", in Ranabir Samaddar (ed.), Rufugees and the State: Practice of Asylum and Care in India, 1947-2000 (New Delhi : Sage Publications India Pvt Ltd, 2003), p. 224.

২৫. সাক্ষাৎকার, রতন মাঝি ও কার্তিক ব্যানার্জী (জয় বাংলা কলোনি, হাসনাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪।

২৬. ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত রোম সংবিধির ৭ নম্বর আর্টিকেলে প্রদত্ত মানবতাবিরোধী অপরাধের (Crime Against Humanity) সংজ্ঞাটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এই সংজ্ঞা অনুসারে বেসামরিক মানুষের উপর পরিকল্পিত/সচেতন আক্রমণ, হত্যা, উচ্ছেদ, দাসত্ব, জাতিবিদ্বেষ, বন্দীত্ব, নির্যাতন, নারী নির্যাতন প্রভৃতি মানবতাবিরোধী অপরাধ। জাতিসংঘের জেনোসাইড প্রিভেনশান অ্যান্ড দ্য রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট-এর ওয়েবসাইটের এই লিংকে বিস্তারিত সংজ্ঞাটি রয়েছে। লিংক (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রাপ্ত): http://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.html. মানবতাবিরোধী অপরাধ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Human Rights Watch, Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity (New York: Human Rights Watch, 2006), pp. 192-233.

২৭. বনগাঁ এলাকায় এই ধরনের চারশত অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ছিল বলেও হ্যাস্টিংস-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। দেখুন, মাসুদুল হক, বাঙালি হত্যা ও পাকিস্তানে ভাঙন (ঢাকা: সুচয়নী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পঃ ৩১৫।